স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০২১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

অলোক কোরা

নিবন্ধন সংখ্যা- A00HI1201219

বর্ষ- ২০১৯

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ সুন্দরবন তার সামুদ্রিক ও মোহনার মৎস্য সম্পদের জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাছাড়া সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ জলাশয়, খাল, বিল ও মাছ চাষের ভেড়ি থেকেও প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। সুন্দরবনের জনসংখ্যার একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী এই মৎস্য কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল, যারা মৎস্যজীবী নামেই পরিচিত। এই মৎস্য আহরণ সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, তাছাড়া সুন্দরবনের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই মৎস্য সম্পদকে। মানবজাতির মাছ ধরা জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রাচীন মাধ্যম। আধুনিক বিশ্বে এই মৎস্য সম্পদের প্রতি মানুষের মনোযোগ বেড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুন্দরবন বন্যপ্রাণী ও বিষাক্ত সাপের বাসভূমি ছিল। তাসত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার ব-দ্বীপের এই জলাবদ্ধ বনভূমিকে তাদের রাজস্বের উৎস হিসেবে দেখেছিল। এর ফলে সুন্দরবন পুনরুদ্ধার হয় এবং শ্বাপদসংকুল আতিথ্যহীন অঞ্চলগুলি চাষের জমিতে পরিণত হতে থাকে। সুন্দরবন আবিষ্কৃত হয়েছিল একথা সত্য নয়, কেননা এই অঞ্চলের চন্দ্রকেতুগড়, ছত্রভোগ, জটার দেউল, জি-প্লট, রাক্ষসখালি, হরিনারায়ণপুর, আটঘড়া, খাড়ি, কঙ্কনদীঘি, মণির তট ইত্যাদি স্থানের থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন সুন্দরবনের ঐতিহ্যকে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের পরিক্রমায় সুন্দরবন বিভিন্ন সময়ে কালের গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের সময়কালে এই অঞ্চল পুনরায় অন্ধকার থেকে আলোতে উদ্ভূত হয়েছিল। সুন্দরবনের আধুনিক ইতিহাস অবশ্য ঔপনিবেশিক পুনরুদ্ধার নীতির বাস্তবায়নের ফল। জমির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার জন্য সুন্দরবনের জনসংখ্যার সিংহভাগ ছোটনাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের অর্থাৎ উত্তরের সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীদের

নিয়ে আসা হয়েছিল। জমির পুনরুদ্ধারের পর সমগ্র সুন্দরবন কৃষি উৎপাদনকারী ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। তামাক, মটর, সরিষা, মরিচ, বেগুন, পেঁয়াজ, তরমুজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সব ফসল এখানে চাষ হত। সুন্দরবনের এই অঞ্চলে অন্য কোন পেশা না থাকার কারণে এখানকার মানুষেরা কৃষিকাজের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে মাছ ধরা, কাঠ কাটা ও মধু সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করত। সুতরাং কৃষিকাজ হল সুন্দরবনের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি এবং মৎস্য ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ হল তাদের সহায়ক মাধ্যম। বর্তমানে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে মৎস্য সম্পদ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি হলেও ১৯৪৭ সালের পর থেকে ২০২১ সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় এই এলাকার জীববৈচিত্র্য, স্থায়িত্ব ও মৎস্য সম্পদের অস্তিত্ব এবং মৎস্যজীবীদের জীবিকার মধ্যে সংকট তৈরি করেছে, তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। এইসব সমস্যা সত্ত্বেও সুন্দরবনে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা এখানে সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, নানা কারণে তারা এই সমাজ গড়ে তোলে। প্রাচীন ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে, সভ্যতার ইতিহাসে নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বড় বড় সভ্যতা, গড়ে উঠেছিল নদীমাতৃক সভ্যতা। এই নদীমাতৃক সমাজ ব্যবস্থায় মৎস্যশিকার পেশাটির প্রাচীনতা অস্বীকার করা যায় না। সুপ্রাচীন এই পেশাটি অনেকাংশে অন্যান্য পেশা অপেক্ষা আলাদা। একা একা এই পেশা সম্ভব নয়। মাছ ধরা ও মাছ চাষ একটি যৌথ প্রক্রিয়ার পেশা, সংঘবদ্ধতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে এই পেশার সফলতা। মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এইভাবেই পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাজ গড়ে তোলে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রেও একথা সমান

ভাবে প্রযোজ্য। পেশার সুবিধার্থে মৎস্যজীবী মানুষেরা নদী-জলাশয়ের ধারে, গ্রামের প্রান্তে বসবাস করে জীবিকা নির্বাহ করে, বহু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে মৎস্য প্রিয় মানুষের কাছে এই সম্পদ তারা তুলে দেয়।

সুদূর অতীত থেকে মাছধরা এই ব্যাপারটাই শিকার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। সভ্যতার সূচনাতে মানুষ তাদের জীবন ধারণের জন্য মৎস্যশিকারকে উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছিল। ডেভোনিয়ান সময় অর্থাৎ ৪১.৯২ কোটি থেকে ৩৫.৮৯ কোটি বছর সময়কাল থেকে মাছ ৩৫০ মিলিয়ন বছরেরও বেশি সময় ধরে জলজ পরিবেশে বাস করছে। ইংল্যান্ডের ডেভন অঞ্চল থেকে প্রথম এই যুগের পাথরের প্রাপ্তি ও গবেষণার সুবাদে অঞ্চলটির নামে যুগের নামকরণ হয়েছে ডেভোনিয়ান যুগ। এই সময় জলভাগে মাছেদের বহুসংখ্যক প্রজাতির আবির্ভাব ঘটার কারণে ডেভোনিয়ান সময়কালকে মাছের যুগ বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন প্রস্তর সময়কাল থেকে মানুষ মাছকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। যার ধারা আজও বজায় রয়েছে। মেগালিথিক (Megalithic) যুগ থেকে (খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০-৬,০০০) মানব সভ্যতার কাছে মাছ ধরার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরে ও রোমে মাছ চাষের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। চীন দেশে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু হয়েছিল। চীন হল প্রথম দেশ যে পদ্ধতিগত মৎস্য চাষ শুরু করেছে, এবং এই মৎস্য চাষকে একটি শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। টেলিকিডসের রচনা থেকে জানা যায় ৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সময়ে গ্রীসবাসীরা খাদ্য হিসেবে মাছকে গুরুত্ব দিত। রামায়ণ ও মহাভারতে ধীবর জাতি ও তাদের মাছ ধরা (Capture Fishery) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ছিল মৎস্যগন্ধ্যা ও ঋষি পরাশরের পুত্র। পঞ্চপাণ্ডবের অর্জুন স্বয়ংবর সভায় অলক্ষ্যে

ঝোলানো মাছের চোখ তীরবিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে স্ত্রীরূপে লাভ করে। ঋষি সৌভরী সুখে ক্রীড়ারত সন্তান-সন্ততিসহ মৎস্যকে দেখে সংসার-ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল। সুশ্রুতের রচনা (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (৩২১-৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) এবং রাজা সোমেশ্বরের মনসোল্লাসা (১১২৭ খ্রি.) এর মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে মাছ চাষের উল্লেখ রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে মাছের উল্লেখ রয়েছে। এখানে মৎস্য জগৎপালক বিষ্ণুর প্রতীক। "Fish occupies an important place in the Indian mythology, history and tradition. For instance, one of the incarnations of God was in the form of fish, Matasyavatara. Fish is also a symbol of Vishnu or Buddha. Among Hindus, it is an incarnation of God Vishnu." ভারতবর্ষে মাছ ধরার শিল্প খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে শুরু হয়েছিল। প্রাক-ঐতিহাসিক কালের মহেঞ্জোদারো সভ্যতাতে মানব-মানবীদের কাছে মৎস্য শিকারের কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল বলে জানা যায়। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের কাছে মাছ খাদ্য হিসাবে খুব প্রিয় ছিল। তবে বৈদিক যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-১০০০ অব্দ) মানুষের কাছে মাছ ধরার প্রচলন ছিল কিনা সঠিক ভাবে জানা যায় না। খনার বচনেও মাছ চাষের উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদে মৎস্য শুধুমাত্র একবার উল্লেখ রয়েছে। অথর্ববেদ, সংহিতা, উপনিষদ ও সূত্রে মাছ ধরার জালের উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসে দ্রাবিড়ীয়দের মধ্যে মাছ ধরার প্রবণতা দেখা যায়। সম্রাট অশোকের সময়ে তার প্রজারা বৈজ্ঞানিক ভাবে মাছ চাষ করতেন বলে জানা যায়। অশোকের পঞ্চম স্তম্ভানুশাসন (খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৬ অব্দ) থেকে জানা যায় মাছের সংরক্ষণ (Conservation) ও প্রজনন ঋতুতে মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধীয় (Closed Season) বিধান।

ইতিহাসে মাছ ধরার কাজে যুক্ত কৈবর্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মনুসংহিতায়, যেখানে তাদেরকে মিশ্র জাতি (Mixed Origin) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে এই কৈবর্ত আবার 'Nonbramanyas' বলে উল্লিখিত হয়েছে। "The first historical mention of the Kaibartas is found at the time of the Pal Dynasty when a Kaibarta rule was established in Barendri in North Bengal after killing Mahipal-II of the Pal Dynasty." বিষ্ণুপুরাণ থেকে জানা যায় যে, কৈবর্তরা ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কৃতি কেন্দ্রের বাইরে থাকতো। মনুসংহিতায় উল্লিখিত হয়েছে যে কৈবর্তরা ছিল নৌকার মাঝি। বৌদ্ধজাতক গল্পে (Older than the first and second century B.C.) জেলেদেরকে কেবাত্তা (Kebatta) বা কেবার্তা (Kebarta) বলা হয়। আজও পূর্ববঙ্গের কৈবার্তারা হয় জেলে না হয় নৌকার মাঝি। খ্রিষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কৈবর্তরা বাংলায় কেবাত্তা নামে পরিচিত ছিল। বৃহৎধর্মপুরাণে (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ) ৪১ টি বর্ণের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে স্বতন্ত্র দুই বর্ণ— ধীবর (মাছ ব্যবসায়ী) এবং জালিয়া (জেলে/মৎস্যজীবী)। তাছাড়া এখানে রাজবংশী ও মালো নামে দুটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে, যাদের জীবিকা মাছ ধরা ও বিক্রি করা। পুরাণ থেকে যেমন মাছ ও মৎস্যজীবীর কথা জানা যায়, প্রাচীন সাহিত্য থেকে তেমনি মৎস্য প্রীতির কথা জানতে পারা যায়। গৌরী সেন প্রাচীন যুগ থেকে বাংলা ও মিথিলার নিবিড় সম্পর্কের কথা বোঝাতে জনৈক মৈথিলী কবির কথায় বলেছেন—

"কোচ্চিবদন্ত্যমৃতমস্তি পুরে সুরানাং।
কোচ্চিবদান্ত বনিতাধরপল্লবেষু।।
ব্রুমো বয়ং সকল শাস্ত্র বিচার দক্ষাঃ।
জম্বীর নীর পরিপুরিত মৎস্য খন্ডে।।"

অর্থাৎ কেউ বলে অমৃত আছে স্বর্গে, কেউ বলে নারীর অধর সুধাই দিতে পারে অমৃতের আস্বাদ, কিন্তু সকল শাস্ত্র বিচার করে মনে হয়, মাছের ঝোলের সাথে জামির লেবু মেখে ভাত খেয়ে যে সুখ হয় তাই অমৃত আস্বাদন।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য মাছের অসংখ্য উদাহরণে সমৃদ্ধ। চণ্ডীদাস তাঁর লেখায়, দ্বীজ-বংশীবদন সিংহল সম্রাটকে দেওয়া উপহারের তালিকায় শুঁটকি মাছ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত ম্যাঙ্গোফিস বা তপসে মাছের প্রশস্তি করেছেন। অমৃতলাল ইলিশ, রাজকৃষ্ণ রায় ইলিশ-তপসে মাছের উল্লেখ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যে মাছের উপমা রয়েছে। কবি হেমচন্দ্র মাগুর মাছের ঝোল নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইলিশকে নিয়ে ছন্দের কবিতা লিখেছেন, রবিঠাকুর তাঁর লেখাতে মাছ ধরার বর্ণনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মাছ ও বঁড়শির উল্লেখ রয়েছে। মাছ এইভাবে আমাদের জীবন-জীবিকা, ঘরোয়া আলাপ, কবিতা-রম্যরচনা, ভালবাসা-শ্রদ্ধা, বিরহে-মিলনে, দুঃখে-সুখে জড়িয়ে আছে। মাছ আমাদের জীবনে এমনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মৎস্য সংস্কৃতি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী ৭০ শতাংশ মানুষই কোন না কোন ভাবে মাছের সাথে যুক্ত, তৈরি হয়েছে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। বংশ পরম্পরায় জাল বুনে, মাছ ধরে, জলের রং দেখে মাছের উপস্থিতি বোঝা, আবহাওয়ার চেহারা বোঝা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে লড়াই, বাঘ-কামট-কুমিরের ভয় এসবের মাঝে জীবন যুদ্ধের মানসিক শক্তি নিয়ে অসামান্য পেশাগত দক্ষ এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়।

গবেষণা সন্দর্ভের সময়কাল

এই গবেষণা সন্দর্ভের নামকরণ করা হয়েছে স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০২১)। উল্লিখিত গবেষণা সন্দর্ভের সময়কাল ১৯৪৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করেছি। গবেষণা শুরুর সময়কাল হিসেবে ১৯৪৭ সাল নেওয়ার উদ্দেশ্য হল, ১৯৪৭ সালের পরে অখণ্ড সুন্দরবন ভারতবর্ষ ও পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মধ্যে দ্বিখন্ডিত হয়। এই গবেষণার শিরোনামে যে সুন্দরবনের ইতিহাস পর্যালোচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা ভারতীয় সুন্দরবন। সেকারণেই যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে ১৯৪৭ সালকে নির্বাচন করেছি। মৎস্যজীবীদের ইতিহাস চর্চায় ২০২১ সালকে নির্বাচন কারণ হল, ভারত সরকার ২০২১ সালে যে নতুন মৎস্যবিল এনেছে তার দ্বারা বহুমুখী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে উপকূলীয় মৎস্য শ্রমিক ও ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের জীবিকা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশিত সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যার যে চাপ তা সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকার উপর আঘাত এনে বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়কে আরও প্রকট করে তুলেছে। তাছাড়া ২০২১ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমফান ও ইয়াস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নোনা জলের মাছ চাষিদের সহায়তা করার জন্য 'স্বর্ণমৎস্য যোজনা' নামে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা কিভাবে মৎস্যজীবীদের জীবিকার উপর পরিবর্তন এনেছে তা এখনও জানা যায়নি। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ বা International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) এর রেড লিস্ট অফ ইকোসিস্টেম ফ্রেমওয়ার্ক-এর অধীনে ২০২০-২১ সালের মূল্যায়নে ভারতীয় সুন্দরবনকে বিপন্ন বলে উল্লেখ করেছে। তাছাড়া এই

সময়কালের মধ্যে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকায় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তাই বর্তমান গবেষণায় এই সামগ্রিক সময়কালকে বিশ্লেষণ করেছি।

আমার বিশ্লেষণের প্রধান উপজীব্য হল ভারতীয় সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ ও মৎস্যজীবীরা। বর্তমানে আমাদের দেশে মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক জীবনের উন্নয়নে মৎস্য শিকারের অবদান রয়েছে। মাছের উৎপাদন ১৯৫০ সালের ৮,০০,০০০ টন থেকে ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে ৪.১ মিলিয়ন টন বেড়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ভারতীয় মৎস্য শিল্প ত্বরান্বিত হয়েছে, মোট সামুদ্রিক এবং মিষ্টি জলের মাছের উৎপাদন প্রায় ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। ২০০৬ সালে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তার কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য চাষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি নিবেদিত সংস্থার সূচনা করে। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে উপকূলীয় মৎস্য চাষকে আধুনিকীকরণ এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরাকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাপক ও নিবিড় অভ্যন্তরীণ মাছ চাষের প্রচারের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে উপকূলীয় মৎস্য উৎপাদন ১৯৫০ সালের ৫২,০০,০০০ টন থেকে ২০১৩ অর্থবছরে ৩.৩৫ মিলিয়ন টন বেড়েছে। ২০০৮ সালে ভারত মৎস্য উৎপাদনে, বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ পণ্যের ১% এরও বেশি অবদান রেখেছিল। ভারত বিদেশে মাছ রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসছে। এই মৎস্য যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেয় সেই সঙ্গে বৃহৎ কর্মসংস্থানের জায়গাও তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ সালে মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ৫৮ লক্ষ ৮২ হাজার মেট্রিক টন, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ সালে রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি। সারা ভারতে মৎস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়। ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ১৭.৪২

লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন করেছে। যার একটা বড় অংশের মৎস্য উৎপাদন সুন্দরবনের নদী-খাল-বিল, জলাশয় ও সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মৎস্যকে কেন্দ্র করে ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে বসবাসকারী অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবিকার মাধ্যম হিসাবে এই সম্পদ কাজ করে চলেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উন্নয়নশীল ১৯টি ব্লক নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবনের জনবসতি। সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। সুন্দরবনে প্রায় ৫ লক্ষের অধিক মানুষ সরাসরিভাবে মৎস্য কেন্দ্রিক জীবিকার সঙ্গে জড়িত। সুবিস্তৃত এই সুন্দরবনের মানুষের মৎস্য চাষ ও মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্রিক জীবন-জীবিকার ইতিহাস খুবই ঘটনাবহুল। মৎস্যজীবীদের জীবন প্রকৃতি নির্ভর, যেকারণে মৎস্যজীবীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উপেক্ষা করা যায় না। মাছ ধরা মানব সমাজের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম। সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী এই জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরাকে তাদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল মাছের সহজলভ্যতা, মৎস্য চাষ এবং বড় জাতের মাছের প্রতি এই অঞ্চলের মানুষদের ভালোবাসার কারণে। তাই মৎস্যের সাথে তাদের সম্পর্ক এতটাই নিবিড় যে প্রকৃতিই তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক। ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বড় মৎস্যক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল এবং তারা প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষে মাছ ধরার প্রথাগত অধিকার উপভোগ করতে পারত। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ধীরে ধীরে জলাশয়ের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলে মৎস্যজীবীদের জীবিকার পরিসরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আবার স্বাধীনোত্তর পর্বে এই মৎস্য

নির্ভর জীবিকাই মৎস্যজীবীদেরকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পরিপূর্ণতার পথে চালিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। সুন্দরবনের পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজজীবন, জলসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, ও সংস্কৃতি নিয়ে যে বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠেছে, সেই বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন চিত্র তুলে ধরাই আমার গবেষণার উদ্দেশ্যে।

সাহিত্য পুনঃসমীক্ষা

প্রাথমিক ভাবে মৎস্যজীবীদের নিয়ে চর্চা হত পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের জীবন-জীবিকা ও সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ গুলিকে গবেষণা কাজের সুবিধার্থে আলোচনা করতে পারি। W W Hunter (1875), তাঁর 'A Statistical Account of Bengal: Districts of the 24 Parganas and Sundarbans' গ্রন্থে জেলে জাতি, তাদের সংখ্যা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন। L. S. S. O'Malley (1914), তাঁর 'Bengal District Gazetteers: 24 Parganas' গ্রন্থে বাংলার উপকূলীয় জেলাগুলির মৎস্যজীবীদের প্রসঙ্গ ও তাদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার প্রসঙ্গে তথ্য দিয়েছেন। K. G. Gupta (1908), তাঁর 'Reports on the results of Enquiry into the Fisheries of Bengal and into Fishery Matters in Europe and America' তথ্যে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও তাদের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার মৎস্য বিষয়ক অনুসন্ধানও লিপিবদ্ধ করেছেন। B. Hamilton (1822), তাঁর 'An Account of the Fishes found in the River Ganges and its Branches' গ্রন্থে বাংলার মৎস্যের বর্ণনার পাশাপাশি, জেলেদের মৎস্য ধরার প্রযুক্তি ও মেছোদের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরেছেন। একই ভাবে T. C. Das (1931), 'The

Cultural Significance of Fish in Bengal' প্রবন্ধে বাঙালির জীবনে মাছের বহুমুখী ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। Dr. Sundarlal Hora, Journal of the Asiatic Society of Bengal (1932 to 1955) জার্নালে প্রকাশিত 'Ancient Hindu Conception of Correlations between form and Locomotion of Fishes', 'Knowledge of the Ancient Hindus Concerning Fish and Fisheries of India', and 'Symposium of Hilsa and its Fiseries', এই গবেষণামূলক নিবন্ধগুলিতে ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন হিন্দুদের মাছ, মাছের বিপণন, মাছ চাষের সমস্যা, মাছ ধরা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রদান করেছেন। K. C. Saha (1970), তাঁর 'Fisheries of West Bengal' গ্রন্থে ফিশারি সম্পর্কিত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি উপকূলের অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ, মোহনা ও সমুদ্রে মাছ ধরা, এবং মাছের বাজারজাতকরণ, মাছের সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মৎস্যজীবীদের অবস্থা সম্পর্কে একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। Arne Martin Klausen (1968), তাঁর 'Kerala Fishermen and Indo-Norwegian Pilot Project' গবেষণামূলক গ্রন্থে কেরলের উপকূলের দুটি পাশাপাশি গ্রামের মৎস্যজীবীদের জীবনের উপর প্রযুক্তি ও অর্থনীতির ভূমিকা কিভাবে পড়েছিল, সেই চিত্র তুলে ধরেছেন। Rup Kumar Barman (2008), তাঁর 'Fisheries and Fishermen A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal' গ্রন্থে ঔপনিবেশিক বাংলা এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জেলে সম্প্রদায়, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং ঔপনিবেশিক আমলে মাছ ধরার শিল্পের বাণিজ্যিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি

জেলেদের প্রতি উত্তর-ঔপনিবেশিক চ্যালেঞ্জ এবং জেলেদের মর্যাদা উন্নীত করার জন্য রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাগুলির সমালোচনা মূলক পর্যালোচনা করেছেন। এই আলোচনায় বিভিন্ন জাতির মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকার দিকটা তুলে ধরে আরও বেশি তথ্য সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। Bikash Raychaudhuri (1980), তাঁর "The Moon and the Net: Study of A Transient Community of Fishermen At Jambudwip" গ্রন্থে সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপে বসবাসকারী মৎস্যজীবীরা যে নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ব্যবসার উপর বিশাল কর্মকান্ড পরিচালিত করত, তাদের মূল বাসস্থান সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন। মৎস্যজীবীরা তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মাছ ধরার কাজে যুক্ত থেকে অর্থনৈতিক জীবন অতিবাহিত করছে তাও তিনি আলোচনা করেছেন। Suman Kalyan Samanta (2022), 'Continuity and Change of the Traditional Fishing Communities: A Study of Purba Medinipur Coast' গ্রন্থে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক জীবিকার জটিলতায় তাদের অর্থনীতিকে কিভাবে পরিচালিত করছে সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। S K Pramanik (1993), তাঁর "Fishermen Communities of Coastal Villages in West Bengal" গ্রন্থে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুলতানপুর ও হারা নামক দুটি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের জীবনের প্রতি আলোকপাত করেছেন। Annu Jalais (2010), তাঁর 'Forest of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans' গ্রন্থে সুন্দরবনের নানা দিকের খন্ডিত ইতিহাস বিশ্লেষণ করে, মূলত সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যজনিত প্রশ্নে বাঘের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আলোকপাত করেছেন। ইন্দ্রানী ঘোষাল (২০০৬), তাঁর "সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য" গ্রন্থে

মৎস্যজীবীদের জীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, (২০০৭) 'সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ' গ্রন্থে সুন্দরবনের অর্থনীতিকে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরেছেন। Sutapa Chatterjee Sarkar (2010), তাঁর 'The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals' গ্রন্থে সুন্দরবনের জমি উদ্ধার, পোর্ট ক্যানিং ও গোসাবা সমবায়ের উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান নদীর জোয়ার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। সতীশ চন্দ্র মিত্র (১৩২১, ১৯৬৫), তাঁর দুই খন্ডে রচিত 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে সুন্দরবনের উত্থান, মানুষের বাসস্থান সংক্রান্ত ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এই বঙ্গে মোগল, পাঠান ও ব্রিটিশ আধিপত্য নিয়েও আলোচনা করেছেন।[৪১] সুন্দরবনের ইতিহাস রচনায় বই দুটিকে প্রামাণ্য দলিল বলা যেতে পারে।

কেবলমাত্র ইতিহাসমূলক গ্রন্থ নয় সুন্দরবনকে জানা ও চেনার জন্য সাহিত্যমূলক গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবন সমগ্র' (১৩৭১), ও 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' (১৩৬৮), অমিতাভ ঘোষের (2005), 'The Hungry Tide' প্রভৃতি রচনা থেকে সুন্দরবনকে আরও বেশি করে জানা যায়। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৩৬৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৩৫৫) ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৩৬৫), প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে জেলে ও তাদের মাছ ধরার জীবন কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এই সাহিত্য ও উপন্যাসগুলি ইতিহাস রচনার এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। এই সব রচনার মধ্য দিয়ে আমার গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে নিম্নলিখিত প্রশ্ন গুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। **প্রথমত,** পেশা হিসাবে মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কিভাবে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে? **দ্বিতীয়ত,** স্বাধীন ভারতে সরকারি প্রকল্প ও প্রগতির প্রচেষ্টাগুলি মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকায় কতটা প্রভাব ফেলেছিল? **তৃতীয়ত,** সরকারি সহযোগিতা ও বাজার অর্থনীতির দ্বারা সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অস্তিত্বের অবস্থা কিভাবে প্রভাবিত হয়? **চতুর্থত,** মৎস্যজীবীদের অর্থনীতির রূপরেখায় প্রযুক্তির কি ভূমিকা রয়েছে? **পঞ্চমত,** পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় মৎস্যজীবীদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কি ধরণের প্রভাব নিয়ে এসেছে?

সুন্দরবনের কাকদ্বীপ কিংবা নামখানার মৎস্যজীবীদের নিয়ে আলোচনা থাকলেও, সমগ্র সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের নিয়ে সেই রকম ভাবে কোন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। মাছধরা ও মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলোকে কোন জাতিগত বিভাজন না করে 'মৎস্যজীবী' এই সাধারণ পরিচিতির মধ্য দিয়ে আমি আমার গবেষণার পর্যালোচনা করেছি। আমার গবেষণার মাধ্যমে নিম্নলিখিত আরও বেশ কিছু প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি—মৎস্যজীবী জেলে মানুষেরা সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে তাদের জীবন চালিত করছে? সরকারি নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে তাতে কি ধরণের প্রভাব পড়েছে মৎস্যজীবীদের উপর? নদী-সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের নিজস্ব বা বংশানুক্রমিক যে পদ্ধতিগত জ্ঞান এবং সরকারি নিরাপত্তামূলক ঘোষণা কিভাবে তাদের সহযোগিতা করে?

অধ্যায় বিভাজন

এই গবেষণা সন্দর্ভের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কিছু অজানা ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার নানা দিক বিশ্লেষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত চারটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **সুন্দরবনের গঠন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও মৎস্যজীবীদের সমাজ-সংস্কৃতি**। উক্ত অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক সময়কালে অবিভক্ত সুন্দরবনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ১৭৭০ সাল থেকে টিলম্যান হেঙ্কেল সুন্দরবনের আবাদ ভূমির সংস্কার করিয়ে ইজারা প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব লাভের জন্য বসতি গড়ে তুলেছিলেন সেই ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ১৭৭০ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সরকারের প্রচেষ্টায় যে ভূমি সংস্কার হয়েছিল অর্থাৎ সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের যে গঠন, তা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর সুন্দরবন দ্বিখণ্ডিত হয়। স্বাধীনোত্তর পর্বেও সুন্দরবনের জঙ্গল সংস্কারের কাজ থেমে থাকেনি, ১৯৭৮ সাল পর্যন্তও সুন্দরবন সংস্কার করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১০২ টি দ্বীপ নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবনের আয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার, ৫৪ টি দ্বীপে মানুষের বসতি নির্মিত হয়েছে। সুন্দরবন বহু নদী-খাল-খাঁড়ি সহ বনজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। সুন্দরবনের এই ভৌগোলিক সমৃদ্ধি বিশ্বের কাছে এক অনন্যতা প্রদান করেছে। সুন্দরবনের ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভগবতপুরে ১৯৭৬ সালে গড়ে তোলা হয়েছে কুমির প্রকল্প। ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি বনাঞ্চলের ৩৬২.৪০ বর্গ কিলোমিটার, হ্যালিডে দ্বীপের ৫.৯৫ বর্গ কিলোমিটার এবং লোথিয়ান দ্বীপের ৩৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ১৯৭৬ সালে ‘বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য’ ঘোষণা

করা হয়েছে। সুন্দরবন ১৯৮৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলাকে ভেঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা গঠন করা হয়, এই দুই পরগণার ১৯ টি উন্নয়নশীল ব্লক নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবনের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনোত্তর পর্বে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সুন্দরবনের জনসংখ্যার বৃদ্ধির তারতম্য বজায় রেখে, বর্তমানে ৫০ লক্ষাধিক জনসংখ্যার মধ্যে ৫ লক্ষের অধিক মানুষ মৎস্যজীবী হিসেবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। সুন্দরবনের সেই সমাজ কাঠামোতে মৎস্যজীবীদের নিয়তি নির্ভর সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের যে চিত্র তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যে বিরামহীন লড়াই করে তারা বেঁচে থাকে তা লোকানুষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন দেব-দেবী, তাদের ব্রতকথা, নিয়তি নির্ভর এই সুন্দরবনে রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে গুনিনের মন্ত্র মৎস্যজীবীদের কিভাবে বাঁচিয়ে রাখে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও মৎস্যজীবীদের অবস্থান**। এই অধ্যায়ে ১৯৪৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়কালে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ (Sundarban Development Board) গঠনের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য সরকারি পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ ও মৎস্য খামার তৈরি, সামাজিক বনায়ন, রাস্তার বাঁধ, কালভার্ট, ব্রিজ এবং জেটি প্রভৃতি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য। ১৯৭৮-৭৯ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। সুন্দরবনের বিস্তৃত এলাকার নদী, খাল, খাঁড়ি, জলাশয়,

মোহনার মৎস্য সম্পদের অভাবনীয় উপস্থিতি মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান নিয়ন্ত্রক। ১৯৮১-৮২ সালে IFAD (International Fund for Agricultural Development) প্রকল্পের অধীনে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় চিংড়ি, লোনা জলের মাছ চাষের খামার তৈরির বিষয়ে সহযোগিতা করে। এই ভাবে সুন্দরবনে মাছ ধরা ও মাছ চাষের গুরুত্ব বাড়তে শুরু করেছিল। সুন্দরবনের এই মৎস্যজীবী প্রান্তিক মানুষেরা বহু প্রতিকূলতা ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে মৎস্য প্রিয় মানুষের মুখে এই পুষ্টিকর খাদ্য তুলে দিচ্ছে, যাদের নিজেদের পুষ্টি পরিপূর্ণ হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন— মৎস্য চাষের ঋণ দান, চারাপোনা বিতরণ, মৎস্যজীবীদের গৃহনির্মাণ, মাছ চাষের পদ্ধতি সংক্রান্ত শিক্ষাদান, বার্ধক্যভাতা প্রকল্প, মৎস্যজীবীদের দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্প, মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা ও মাছ চাষের সরঞ্জাম বিতরণ প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলি বর্তমান সময়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকার উন্নয়নে যে গতিময়তা এনেছে তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া RKVY (Rashtriya Krishi Vikash Yojana), NFDB (National Fisheries Development Board), FFDA (Fish Farmers Development Agency) এবং STCP (Short-Term Cost Plan) প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিবাচক পরিকল্পনা মিষ্টি জলে মাছ চাষ ও নোনা জলে মাছ প্রকল্প এনে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত করেছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক জীবন চিত্র**। উক্ত অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক রূপরেখা। এপ্রসঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সংগ্রাম ও মৎস্য ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আড়তদার-দাদনদার প্রমুখের দ্বারা সৃষ্ট শোষণ-নিপীড়ন ও তাদের সামাজিক অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি

তুলে ধরা হয়েছে। মৎস্য মূলত একটি অর্থকরী পেশা হলেও সুন্দরবনের দরিদ্র মৎস্যজীবীরা এখান থেকে খুব একটা লাভবান হয় না, তাসত্ত্বেও সুন্দরবনের জঙ্গলে, নদী-খাঁড়ি ও সমুদ্রে গিয়ে চরম প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করে মৎস্য শিকার করতে যেতে হয় সেই প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে। শুকনো মাছের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপে সৃষ্ট জটিলতা মৎস্যজীবীদের জীবিকার প্রতি যে আঘাত এনেছিল সেই সম্পর্কেও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া মৎস্যজীবীরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাঁকড়া ধরে, জঙ্গলের থেকে কাঠ-মধু সংগ্রহ করে কিভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে সেই প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে। ১৯৮০র দশক থেকে সুন্দরবনে ফিশারির রমরমা চলে। যেখানে বাগদার চিংড়ির গুরুত্ব খুব বেশি। বাগদার মীন সংগ্রহ করে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকার একটা দিক উন্মোচিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গও এখানে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **সুন্দরবনের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় ও মৎস্যজীবীদের বিপন্নতা**। এই অধ্যায়ে সুন্দরবনের পরিবেশ সংক্রান্ত ভারসাম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর পর্বেও সুন্দরবন সংস্কার করে মনুষ্য বসতি গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে নতুন করে বসতি নির্মাণ নয়, বিঘার পর বিঘা সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করে মাছের ভেড়ি তৈরি চলছে। এর ফলে সুন্দরবনের ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ যেমন বেড়েছে অন্যদিকে বন কাটার ফলে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হচ্ছে সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের রক্ষায় বনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন না থাকলে সমুদ্র ক্রমশ গ্রাস করে নেবে সুন্দরবনের ভূমিকে। ঔপনিবেশিক আমলে বন আইন তৈরি করে যেমন অরণ্য রক্ষার কথা ভাবা হয়েছিল, স্বাধীনোত্তর পর্বেও বিভিন্ন আইনের মধ্য দিয়ে

সুন্দরবনের প্রকৃতিকে রক্ষার প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সবার সহযোগিতার গড়ে ওঠেনি। নির্বিচারে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধিত হচ্ছে এই বিপন্নতা যেমন আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে সারা বিশ্ব আজ উষ্ণায়নের দহনে জ্বলছে, যার থেকে সুন্দরবনের রেহাই নেই। মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সুন্দরবন বিপন্নতার সম্মুখীন হয়েছে এই প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। সুন্দরবনের ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী হলেও নদীর মৎস্য ধরে জীবিকা নির্বাহ করে ৫ লক্ষের অধিক মানুষ। কিন্তু বর্তমানে সুন্দরবনের এই বিপন্নতায় মৎস্যজীবীদের জীবিকাই আজ বিপন্ন হতে বসেছে। মৎস্যজীবীদের কাছে বিকল্প কোন পেশা নেই যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। তাছাড়া মাছের ওপর সরকারের বিভিন্ন আইন, জঙ্গলে প্রবেশের জন্য বনদপ্তরের নিয়মনীতি মৎস্যজীবীদেরকে অর্থনৈতিক উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছে সে বিষয়ও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের উপসংহার পর্বে আলোচিত হয়েছে **আশা-নিরাশার দোলাচলে মৎস্যজীবীরা**। এই পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন-সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের দুর্দশার চিত্র আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে প্রতিনিয়ত আর্থিক সুখানুভূতির অর্জনের যে প্রচেষ্টা তা এখানে আলোচিত হয়েছে।

গবেষণা কর্মের পদ্ধতি

আমার গবেষণার কাজের জন্য আকর তথ্য উপাদান হিসাবে রয়েছে লেখ্যাগারে সঞ্চিত মৎস্যজীবীদের নিয়ে লিখিত দলিল-দস্তাবেজ ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট এবং মৎস্যজীবীদের নিয়ে লেখা সাহিত্যিক বিবরণ ও ঐতিহাসিক বিবরণ। সহায়ক উপাদান হিসাবে রয়েছে মৎস্যজীবী সম্পর্কিত

নানা গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও জার্নাল। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও গুণগত উভয় ধরণের তথ্য ব্যবহার করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত করা সংগত হবে অধুনা গৃহীত উপাদান হিসাবে Oral Evidence বা মৌখিক ভাষ্য। আমার গবেষণার কাজের সহায়তায় ইতিহাসের পাশাপাশি, সমাজতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত বিষয় গুলি সংযুক্ত করা হয়েছে। গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার (অ্যানেক্স বিল্ডিং), ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, লিটল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগার, ক্যানিং বসন্ত সেন গ্রন্থাগার, বারুইপুর গ্রন্থাগার, মহাকরণ লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করেছি। গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্য উপাদান হিসেবে সুন্দরবন সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি, যেমন— রাজ্য মহাফেজখানা, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, ফিশারি দপ্তর (সল্টলেক), মীন ভবন (বারাসাত), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর (ডায়মন্ড হারবার), পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তর (পাথরপ্রতিমা), ব্লক উন্নয়ন দপ্তর (পাথরপ্রতিমা), ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দপ্তর (কাকদ্বীপ), ব্লক উন্নয়ন দপ্তর (কাকদ্বীপ) প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছি। এছাড়া সুন্দরবনের ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার মৎস্যজীবী, মধু-কাঠ সংগ্রহকারী, সরকারি আধিকারিক প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার কাজ করার চেষ্টা করেছি। সুন্দরবনের প্রান্তিক এই মৎস্যজীবীদের ইতিহাস জানার জন্য উপাদান হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, মুখের কথায় ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সম্পর্কিত ইতিহাস পাওয়া দুর্লভ, তাসত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে গবেষণার তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছি।

আমি নিজেই এই অঞ্চলে বসবাস করি, বঙ্গোপসাগর ও কার্জনক্রীক নদী-মোহনার তীরে অবস্থিত উপকূলবর্তী জি-প্লটে বড় হয়েছি, ছোট থেকে নদীতে মীন-কাঁকড়া ধরেছি, বন্ধুদের সঙ্গে ডিঙি নৌকাতে করে মাছ ধরেছি। তাই মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা, তাদের জীবন-যাপন, সংস্কৃতি ও সমস্ত রকমের আনন্দ বেদনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। তাই আমার গবেষণায় মৎস্যজীবীদের জীবন কিভাবে আরও গতিময় হয়ে উঠতে পারে সেই পথের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিছু প্রথাগত ও প্রচলিত রীতিনীতি, মৌখিক ভাষ্য ও যৎসামান্য লিখিত উপাদান সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মূল হাতিয়ার। আশা করি, নানা প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রান্তিক এই মৎস্যজীবী মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই গবেষণাপত্রটি ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে সহায়ক তথ্য রূপে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদান

ইংরাজি

Land Revenue Administration of Bengal, Land and Land Revenue, Department, Government of West Bengal, West Bengal State Archive, Kolkata.

Annual Report, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Salt Lake, Kolkata.

Census Reports of 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011. (Annex Building, Alipore, Kolkata)

Annual Administrative Report 2004-05. Sundarbans Development Board, Government of West Bengal, Mayukh Bhavan, Kolkata.

Administrative Report 2008-09, Sundarban Affairs Department, Government of West Bengal, Mayukh Bhavan, kolktata.

Annual Fishery Administrative Report, Meen Bhavan, Kolkata.

Hunter W W, A Statistical Account of Bengal – 24 Parganas and Sundarbans – Vol 1, London: Trubner and Company, 1875.

Gupta K G, Reports on the Results of Enquiry into the Fisheries of Bengal and into fishery Matters in Europe and America, The Bengali Secretariat Book Depot, 1908.

Assembly Proceedings, Official Report, West Bengal Lagislative Assembly, Government of West Bengal, Alipore, Kolkata.

Southwell T, Certain Facts Relating to the Fisheries of Bengal, and Bihar and Orissa, Annexed Building, Alipore, Kolkata.

A Note on Fisheries in Sundarbans, Government of West Bengal, Department of Land and Land Revenue, 1958, Annex Building, Alipore, Kolkata.

Saha Dr. K C, Fisheries of West Bengal, Alipore: West Bengal Government Press, 1970.

Ascoli F D, A Revenue History of the Sundarbans 1870-1920, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1921.

The Imperial Gazetteer of India: Provincial Series, Bengal, Vol-I, Calcutta: West Bengal Government Press, Superintendent of Government Printing, 1909.

O'Malley L S S, Eastern Bengal District Gazetteer: 24 Paraganas, Calcutta, 1914.

Lahiri Anil Chandra, Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of 24 Parganas, Calcutta, 1936.

Evaluation of Fish Farmers Development Agency Schemes in West Bengal, Part-I, Indian Statistical Institute, Calcutta, 1990.

De Barun, West Bengal District Gazetteers, South 24 Parganas, Government of West Bengal, March 1994.

19. Mukherjee Dr. Anuradha (Ed.), Sundarban Wetlands, Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbours, Government of West Bengal, 2007.

সহকারি উপাদান

ইংরাজি

Agarwal Dr. Satish Chandra, History of Indian Fishery, Delhi: Daya Publishing House, 2006.

Barman Rup Kumar, Fisheries and Fishermen A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial and Post-Colonial West Bengal, Delhi: Abhijeet Publications, 2008.

Banerjee Anuradha, Environment Population and Human Settlements of Sundarban Delta, New Delhi: Concept Publishing Company, 1998.

Chattapadhyay Haraprasad, The Mystery of the Sundarbans, Calcutta: A Mukherjee & Co PVT Ltd, 1999.

Das Amal Kumar, Sankarananda Mukherjee, and Manas kamal Chowdhuri (Ed.), Calcutta: A focus on Sundarban, Edition Indians, 1981.

Das Gautam Kumar, Hazards and Livelihoods of the Sundarbans, Kolkata: Sopan Publisher, 2018.

Guha Bakshi D N, P Sanyal, and K R Naskar (Ed.), Sundarban Mangal, Calutta: Naya Prokash, 1999.

Mandal A K and Nandi, N C, Fauna of Mangrove Ecosystem, West Bengal, India: Zoological Survey of India, 1989.

Pramanik S K, Fishermen Communities of Coastal Villeges of West Bengal, Jaipur: Rawat Publication, 1993.

Raychaudhuri Bikash, The Moon and the Net: Study of a Transient Community of Fishermen at Jambudwip, Calcutta: Anthropological Survey of India, 1980.

Sarkar Mahua and Bhattacharyya Amit (Ed.), History and the Changing Horizon: Science, Environment and Social Systems, Kolkata: Setu Prakashani, 2014.

Sarkar Chatterjee Sutapa, The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals, New Delhi: Orient Blackswam, 2010.

Sharma B C, Lower Sundarban: Role of Fisheries in its Sustainable Development, Calcutta: The Asiatic Society, 1994.

বাংলা

আহমেদ রাজিব সম্পাদিত, সুন্দরবনের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা: গতিধারা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

কাঞ্জিলাল তুষার, সুন্দরবনের গপ্পোসপ্পো, কলকাতা: আজকাল প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৬।

কুন্ডু সুরেশ, সুন্দরবন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, কলকাতা: নান্দনিক পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০১৯।

গুড়িয়া মহাদেব, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সমগ্র, কলকাতা: পাণ্ডুলিপি, ২০১৩।

গুহ বুদ্ধদেব, বনবিবির বনে, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ১৯৯৫।

ঘোষ অমিতাভ, ভাটির দেশ, অনুবাদ অচিন্ত্যরূপ রায়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৬।

ঘোষাল ইন্দ্রাণী, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জুলাই ২০০৬।

ঘোষ তারাপদ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬।

ঘোষ পূর্ণেন্দু, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্টক্যানিং, কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭।

ঘোষ প্রভাত কুমার, গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি, কলকাতা: জে এস প্রকাশনী, ১৯৮৮।

চট্টোপাধ্যায় সাগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৫।

চৌধুরী কমল, চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

.....: উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭।

.....: দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭।

চক্রবর্তী গৌরাঙ্গ, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, কলকাতা: সেরিবান, ডিসেম্বর ২০০৪।

চক্রবর্তী রঞ্জন ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ, কলকাতা: রীসা রিডার্স সার্ভিস, জানুয়ারি ২০০৭।

চক্রবর্তী প্রফুল্লকুমার, প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুজীবনের কথা, কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

চক্রবর্তী সত্যরঞ্জন, স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ ১৯৫০-২০১১, কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী, ২০১৫।

জলিল এ এফ এম আব্দুল, সুন্দরবনের ইতিহাস, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, জানুয়ারি ২০১৪।

জলিল এ এফ এম আব্দুল, সুন্দরবনের ইতিহাস, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০০।

জানা ডঃ মণীন্দ্রনাথ, সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা: দীপালি বুক হাউস, জানুয়ারি ১৯৮৪।

জানা দেবপ্রসাদ সম্পাদিত, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, নভেম্বর ২০০৪।

তুষার কাঞ্জিলাল, সুন্দরবনের সাতকাহন, কলকাতা: কৃতি, জানুয়ারি ২০১৯।

দত্ত কালিদাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত, (প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড), বারুইপুর: সুন্দরবন সংগ্রহশালা, মার্চ ১৯৮৯।

দত্ত সৌমেন, প্রেক্ষাপট সুন্দরবন, কলকাতা: আজকাল, জানুয়ারি ২০১০।

দাস গোকুল চন্দ্র, চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৪।

দাস ডঃ নির্মলেন্দু, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি, কলকাতা: জ্ঞান প্রকাশন, ১৯৯৬।

দাস গৌতম কুমার, কথা সুন্দরবন, কলকাতা: সোপান, ২০১৮।

দাস মলয়, সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১১।

দাস শশাঙ্ক শেখর, বনবিবি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, মার্চ ২০০৪।

দাশ শচীন, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৯৭।

দে রথীন্দ্রনাথ, সুন্দরবন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৯১।

দে সূর্য্যেন্দু, মাছ জল মৎস্যজীবী, কলকাতা: গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ, ১৪২৪।

নস্কর কুমুদরঞ্জন, ভারতের সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট ১৯৯৮।

.....: প্রকৃতির প্রতিশোধ-সুন্দরবন, কলকাতা: গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৬।

নস্কর ধূর্জটি, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পন, কলকাতা: শ্যামলী পাবলিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৭।